পুঁথিপাঠ ও সম্পাদনা

ড. অণিমা মুখোপাধ্যায়

পুস্তক

॥ সূচি ॥

গ্রন্থকারের নিবেদন ৯

বর্তমান সংস্করণের কথামুখ ১৭

পুঁথি শব্দের উৎপত্তি ও ভাষাতত্ত্বগত তাৎপর্য ১৯

পুঁথি সম্পর্কিত প্রাথমিক কিছু তথ্য ২৩

১। পুঁথির উপকরণ ২। আকার ৩। অক্ষর ৪। বিরাম চিহ্ন ৫। ভ্রম সংশোধনের চিহ্ন ও রীতিনীতি ৬। পত্রাঙ্ক ৭। পুঁথির প্রকার ভেদ ৮। লিপিকাল ৯। লিপিকর ১০। গায়েন ১১। চিত্রকর ১২। পৃষ্ঠপোষক ১৩। বাংলা পুঁথির লেখক ও পাঠক ১৪। ক্রয়বিক্রয় ১৫। পুঁথি চুরিঘ্ন

আত্মকাহিনি ১০৮

ভণিতা ১২৩

কবি শকাব্দ ১৩৬

অব্দ ও বর্ষগণনা ১৮৭

পুষ্পিকা ১৯৭

অলংকরণ ২১২

লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ২৪১

পাঠভেদ ও পাঠবিকৃতি ২৭৬

আপাত অনাবশ্যক 'রেফ' এর ব্যবহার ২৯৯

বাংলা অনুস্বার হরফের ক্রমবিবর্তন ৩১৬

একাঙ্গীভূত বা একীভূত শব্দ ৩২৬

সাদৃশ্যজনিত প্রতিক্রিয়া ৩৩৬

সম্পাদক ও সম্পাদনা রীতি ৩৫১
পুঁথি অনুষঙ্গী শব্দটীকা ৩৭১
পুঁথির পাতার বানান সমস্যা ৩৭৭
বিভিন্ন সময়ের পুঁথির পাতার বর্ণমালা ৩৯১
পুঁথির লিপিকলা বিষয়ে দুচার কথা ৪০০
সম্পাদককৃত পাঠবিভ্রাট ৪১১
নির্দেশিকা ৪২৫

গ্রন্থকারের নিবেদন

আজ থেকে অনেক বছর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে অধ্যায়নের সময়ে বাংলা পুঁথির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। সে সময়ে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে ক্লাসের শেষে, বিকেল চারটের পরে অধীক্ষক শ্রীসুকুমার মিত্রের তত্ত্বাবধানে তিরিশ টাকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে একঘণ্টা করে পুঁথি নকলের কাজ করানো হত। সেই কর্মযজ্ঞে অংশ গ্রহণের ফলেই থরে থরে লাল কাপড়ে জড়ানো, বাংলা সাহিত্যের এক বিচিত্র ও ঐশ্বর্যময় জগতকে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল। সে জগতের সঙ্গে সত্যকার পরিচয় আরও অনেক পরে, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পি এইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে পুঁথি নিয়ে গবেষণা করবার সময়ে। সেই সময় থেকেই ধীরে ধীরে জীর্ণ বিবর্ণ পুঁথির পাতাগুলির সঙ্গে আমার এক আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। অতীত চারণার এক নতুন আনন্দে আমি বিভোর হই। এরও পরে ১৯৮৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উচ্চতর বৃত্তি নিয়ে গবেষণা করবার সময়ে, প্রথম, পুঁথি সম্পর্কিত নানা খুঁটিনাটি প্রশ্ন মনে জাগতে থাকে। বিশেষভাবে পুঁথির লিপিকলা, ভাষা-বৈশিষ্ট্য, বানান বৈচিত্র্য, অলংকরণ, তথা চিত্রকলা ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতি আমি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হই। সুদীর্ঘ সময় ধরে এই গবেষণা কর্মের প্রয়োজনে বিশ্বভারতী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিবিভাগ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান পুঁথিশালাগুলিতে বহু পুঁথি দেখবার সুযোগ হয়। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি বিভাগে Editing and cataloguing-এর কাজে পুঁথি বিশেষজ্ঞ হিসেবে যুক্ত হতে পেরে প্রতিদিন বিভিন্ন পুঁথির অক্ষর, ভাষা, ব্যাকরণ, লিপিগত বৈশিষ্ট্য, অলংকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলি আরও বেশি করে নজরে পড়তে থাকে। সেই সময় থেকেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পুঁথিগুলি থেকে মূল্যবান সব পুষ্পিকা, চিত্রিত পত্র এবং লিপিগত ও ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে প্রয়োজনে আলোকচিত্র সংগ্রহের কাজ শুরু করি। এই সময়ে বাংলা সাহিত্যের দুই প্রথিতযশা অধ্যাপক ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল এবং ডক্টর ভবতোষ দত্ত পুঁথিপাঠ প্রকরণ (Methodology)-এর বিষয়ে একটি বই লিখবার জন্য আমাকে উৎসাহিত করতে থাকেন। সেই থেকে এ কাজের সূত্রপাত।

দীর্ঘ সাত-আট বছর নিরবচ্ছিন্ন কাজ করবার পরে মনে হল, এবার একে দুই মলাটের মধ্যে বাঁধবার সময় হয়েছে। কারণ এই ধরণের কাজের কোনো শেষ নেই। যতই দিন যাবে নতুন নতুন পুঁথি পরীক্ষা করবার সুযোগ হবে, ততই নতুন নতুন তথ্য আহরিত হতে থাকবে। এবং এইভাবে চললে এ অনন্ত যাত্রা কোনোদিনই শেষ হবে না। সুতরাং এক জায়গায় জোর করে থামতেই হয়। আর সেই যাত্রা শেষের মুহূর্তই এই বই-এর জন্মলগ্ন।

পুঁথিকে ভালোবেসে, পুঁথি নিয়ে যাঁরা চিন্তা-ভাবনা তথা গবেষণা করে থাকেন, এরকম গুণীজনের সংখ্যা আজ মুষ্টিমেয়। অতীতে যাঁরা এই বিষয় নিয়ে চর্চা করেছেন এবং এখনও যাঁরা চর্চা করে চলেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই একাধিক পুঁথি সম্পাদনা করে, বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও নিবন্ধ রচনা করে, পুঁথি-গবেষণার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন। এজন্য এঁদের কাছে আমাদের, অর্থাৎ একালের এই পথের পথিক জনের ঋণের সীমা নেই। এই ঋণকে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নিয়েও, একটি কথা এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য যে, এই সব পথিকৃৎ গবেষকেরা বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও নিবন্ধ রচনা করলেও, সামগ্রিক ভাবে পুঁথি বিষয়ক তথ্য ও সম্পাদনা রীতির (Textual Criticism) প্রকরণ বিষয়ক বাংলায় কোনো সাধারণ আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশ করেননি। অন্তত এ বঙ্গে তো নয়ই। অথচ আমাদের দেশে বিভিন্ন সংগ্রহালয়ে হাজার হাজার মূল্যবান পুঁথি তার নিজস্ব সম্পদ নিয়ে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

আজ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দীরও বেশি আগে, ১৯৪১ সালে আলোচ্য বিষয়ের ওপর 'An Introduction to Indian Textual Criticism' নামে একখানি ইংরেজি বই লিখেছিলেন S. M. Katre। প্রচুর পরিশ্রম এবং পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ সে বইখানি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু বাংলায় এই ধরনের কোনো বই নেই। বর্তমান বাংলাদেশে এই ধরনের কিছু কিছু গবেষণামূলক কাজের খবর পাওয়া যায়। এই মুহূর্তে বাংলা আকাদেমি ঢাকা, থেকে প্রকাশিত অন্তত দুটি বই-এর নাম মনে পড়ছে। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম-রচিত 'পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা' এবং মুহম্মদ শাহজাহান মিঞা-রচিত 'বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠ সমীক্ষা'। দুটি বই-এর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক। দুটি বই-ই গভীর পাণ্ডিত্য ও দীর্ঘ পরিশ্রমের সাক্ষ্য বহন করছে। এদের মধ্যে মোহাম্মদ কাইউম-এর বইটি অবশ্য Katre-এর বইটিকে পায়ে পায়ে অনুসরণ করে এগিয়েছে। যদিও পাঠকদের তাতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। এছাড়াও ওই একই সংস্থা থেকে প্রকাশিত, ডক্টর কল্পনা ভৌমিকের 'পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা', বইটিও সুলিখিত। তবে এটি মূলত সংস্কৃত পুঁথির উপর ভিত্তি করে আলোচনা। কিন্তু বলা বাহুল্য এই বইগুলিও আমাদের কাছে খুব সুলভ নয়।

তারাপদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'চর্যাপদ' ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থদ্বয়ে, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিতে, পুঁথি সম্পাদনার রীতি-নীতি, পুঁথির পাঠ-বিচার, লিপিকলা, পাঠ-বিভ্রাট

জনিত সমস্যা ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে বিষদ আলোচনা করেছেন। সে আলোচনায় অগাধ পাণ্ডিত্য ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ে পুঁথির অনেক গভীরে প্রবেশের পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে গ্রন্থের প্রত্যেকটি পৃষ্ঠায়, প্রতিটি বাক্যে। পুঁথি সম্পাদনা বিষয়ক বহু প্রসঙ্গের আলোচনা উক্ত গ্রন্থে স্থান লাভ করলেও, যেহেতু কেবলমাত্র 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পুঁথিই গ্রন্থখানির উপজীব্য, সেইহেতু আলোচ্য গ্রন্থের সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করতেই হয়। এছাড়াও, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, সুকুমার সেন, পঞ্চানন মণ্ডল, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, ক্ষুদিরাম দাস, প্রফুল্লকুমার পাল, সুখময় মুখোপাধ্যায়, পীযুষকান্তি মহাপাত্র, অক্ষয়কুমার কয়াল প্রমুখ বহু পুঁথিবিশেষজ্ঞ ব্যক্তি একাধিক পুঁথির সম্পাদনা করে গেছেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশের গ্রন্থের ভূমিকা, পাদটীকা, পাঠ-পাঠান্তর, টীকা-টিপ্পনী সহ গ্রন্থগুলি কেউ যদি অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেন, তাহলেও পুঁথি সম্পাদনা সম্পর্কিত অনেক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। তা সত্ত্বেও, একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন থেকেই যায়। যাতে সাধারণভাবে পুঁথি সম্পর্কিত নানান তথ্য পাওয়া যাবে। এই প্রসঙ্গে S. M. Katre-র একটি উক্তি এখানে স্মরণ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। "With the increasing interest shown by Indian Scholars in editing their ancient classics from manuscripts preserved in India or abroad, the need of a short manual giving the main principles of textual criticism and showing the proper methods of critical editing is greatly felt."

বেশ কয়েক বছর আগে, বর্তমান লেখিকার "আঠারো শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ" বইটি পড়ে জনৈক ইতিহাসের অধ্যাপক বলেছিলেন, 'আজকাল মধ্যযুগের ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করতে অনেককেই সাহিত্যের দ্বারস্থ হতে হয়। কিন্তু পুঁথি পড়তে না জানবার কারণে ছাপা বই-এর ওপরই নির্ভর করতে হয়। আপনি এমন একটা বই লিখুন, যা পড়ে আমরাও পুঁথি পড়তে শিখতে পারি।'

বর্তমান বইটি পড়ে পুঁথি পড়তে শেখা যাবে কি না জানি না, তবে এটি সে পথের পথিকের অন্যতম প্রাথমিক সোপান হলেও হতে পারে। আসলে পুঁথি-পাঠ এক দীর্ঘ অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ব করা বিদ্যা মাত্র। যে কোনো অধীত বিদ্যার মতোই এটিও অবশ্যই ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের দাবি রাখে। পুঁথি পড়তে শেখবার সম্ভবত সহজতম উপায়, একটিমাত্র পুঁথি নিয়ে, তাকেই বার বার পড়বার চেষ্টা করে যাওয়া। প্রথম প্রথম অধিকাংশ শব্দই দুর্বোধ্য মনে হলেও, তাতে ধৈর্য হারালে চলবে না। দুর্বোধ্য শব্দকে বাক্যের প্রসঙ্গের সাহায্যে মিলিয়ে পড়তে চেষ্টা করলে, তাকে সনাক্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। দুর্বোধ্য অক্ষরগুলিও একইভাবে পরিচিত শব্দের মধ্যে দেখে, তাকে সনাক্ত করা সহজতর হয়ে ওঠে। পরে সেই সেই অক্ষর অন্য কোথায়, কোন্ শব্দের মধ্যে আছে, তার সন্ধান করতে পারলে, দুর্বোধ্য অক্ষর অতি সহজেই পরিচিত হয়ে উঠতে পারে।

পুঁথি শব্দের উৎপত্তি ও ভাষাতত্ত্বগত তাৎপর্য

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতের উত্তর পশ্চিম দিকের কিছু অংশে পারসিক শাসন উভয় জাতির মধ্যে যৎসামান্য হলেও একটি সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এরই ফলশ্রুতিতে খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীর মুসলিম (তুর্কী) অভিযান পর্যন্ত ভারতীয় আর্য ভাষায় বেশ কিছু প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় পারসিক শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে। সম্রাট অশোকের লিপিতে এই ধরনের কিছু শব্দের হদিস মেলে যেমন, 'দিপি' (Dipi), 'নিপিস্ত' (Nipista) ইত্যাদি। তুর্কি, তাজিক এবং আফগানগণ দ্বারা মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পরে এদেশের মুসলিম আদালতে ও অন্যত্র ফারসি (Persian) ব্যবহারিক ভাষা হয়ে ওঠে, যার ফলে উত্তর ভারতীয় আর্যভাষা সরাসরি ফারসি ভাষার সংস্পর্শে আসে ও প্রভাবান্বিত হয়। ফারসি ছাড়া গ্রিক ভাষাও ইন্দো-আর্য ভাষাকে প্রভাবান্বিত করেছে। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭-এর আগে আলেকজান্ডারের অভিযানের পূর্বেও গ্রিক অভিযাত্রী এবং পারসিক রাজকর্মে নিযুক্ত গ্রিক রাজকর্মচারী অনেকে ভারতে আসেন। অবশ্য ৩২৭ খ্রিস্টপূর্বের পরবর্তী শতাব্দ থেকে শুরু করে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত গ্রিক-ভারতীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধন ও ঘনিষ্ঠতা বজায় থাকে এবং এর ফলস্বরূপ দুই ভাষাতেই অপর ভাষা তথা, শব্দের আত্মীকরণ ঘটে যায় স্বাভাবিক নিয়মেই। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় আর্যভাষায় ও সংস্কৃতে বহু গ্রিক শব্দের অনুপ্রবেশ এই পথেই। আধুনিক ইন্দো-আর্য ভাষা এইভাবেই বহু ফরাসি ও গ্রিক শব্দকে নিজের করে নিয়েছে। ইন্দো-আর্য ভাষার ধন্বাত্মক তদ্ভব রূপের মধ্যে যার সঠিক রূপটি ধরা পড়ে। খ্রিস্ট-পরবর্তী সময়ে কিছু ইরানি শব্দেরও প্রবেশ ঘটে মধ্যযুগীয় ভারতীয় আর্য ভাষায়। যেমন, 'মিহির' (Mihira = সূর্য)। পুস্ত (Pust = বই) = [মধ্য পারসিক (পল্লভী) Post (পোস্ত) = Skin for writing অর্থাৎ লিখিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত চামড়া] ইত্যাদি।

আদি ও মধ্যযুগীয় পারসিক > মধ্য ভারতীয় আর্য পুথী, পুথি, পুঁথি [puthi, puthi, punthi] বই, প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে লেখা পাণ্ডুলিপি। প্রাচীন রূপ > পোথী [Pothi] মধ্যযুগীয় ভারতীয় আর্য > পোত্থিয়া [Potthia] ইরানীয় [পল্লভী Pollavi] পুস্ত (Post) = [Skin, Perchment = চামড়া, গাছের ছাল] সংস্কৃতে > পুস্ত, পুস্তক, পুস্তিকা [Pust, Pusta-ka, Pust-ika][১]

ভাষাতত্ত্বের একটি নির্দিষ্ট নিয়মের অনুসরণে পোথী > পুথিতে পরিণত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় এক ধরনের স্বর-পরিবর্তন দেখা যায়, যেখানে পরবর্তী 'দল' (Syllable)-এ যথাক্রমে উচ্চ বা নিম্ন স্বর থাকলে পূর্ব 'দল' স্থানের স্বর উচ্চ বা নিম্ন আকার নেয়। যাকে স্বরসঙ্গতি (Vowel Harmony) বলা হয়। মধ্যযুগের বাংলায় 'পোথা' (বড়ো পুঁথি) বা 'পোথী' (ছোটো আকারের পুঁথি) উপরোক্ত স্বরসঙ্গতির নিয়মে 'পুথি' শব্দে পরিণত হয়েছে। 'পোথা' শব্দের লঘু 'আ' বা 'পোথী' শব্দের 'ঈ', পূর্ববর্তী 'দল'-এর 'ও' কারকে 'উ'-তে পরিণত করেছে।

সংস্কৃত ভাষায় স্বতঃ নাসিক্যিভবন (Spontaneus nasalisation) প্রসূত অনুস্বার বা চন্দ্রবিন্দুর স্বর প্রক্ষেপ দেখা যায়, যাকে শব্দ তাত্ত্বিকেরা ক্ষেত্রবিশেষে স্বাভাবিক আনুনাসিক ধ্বনি পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বলে চিহ্নিত করেছেন; পরবর্তীকালে বাংলা ভাষাতে এবং উত্তর ভারতীয় বা পশ্চিমী হিন্দিতেও এই স্বতঃ নাসিক্যিভবনের প্রক্রিয়াটি লক্ষ করা যায়। কিন্তু লক্ষ করবার বিষয় এই যে, একই শব্দ বাংলায় যখন অনুস্বার বা চন্দ্রবিন্দু যুক্ত, উত্তর ভারত বা পশ্চিমী হিন্দিতে সেই শব্দে আনুনাসিক স্বরের বিলুপ্তি বা ব্যতিরেক, অথবা হিন্দিতে প্রচলিত, বাংলায় অবলুপ্ত হতে দেখা যায়। পুঁথি শব্দের উচ্চারণ প্রক্রিয়াতেও এই ব্যাপারটি লক্ষ করা যায়। পুঁথি (Puthi) (Ponthia) হিন্দি ব্যতিক্রম (পোথি) (Pothia)। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা পুঁথি শব্দটি প্রাকৃত 'পন্থিয়া' (Ponthia) শব্দ থেকে এসেছে বলে অনুমান করেছেন।

আবার আচার্য সুনীতিকুমারের মতে প্রাথমিকভাবে 'পুথি' বা 'পুঁথি' শব্দের 'থ' ব্যঞ্জন বর্ণটি এসেছে সংস্কৃত 'স্ত' বা 'স্থ' থেকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, স্তম্ভ > থাম। এইভাবেই সংস্কৃত 'পুস্তক' বা 'পুস্তিকা' শব্দে 'স্ত' রূপান্তরিত হয়েছে পুঁথি শব্দে। পুথি, পুঁথি < Puthi, Puthi > (Pustika)[২]

সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক শব্দে 'ইকা' যুক্ত হতে দেখা যায় শব্দের শেষে। যেমন 'মৃত্তিকা'। পরবর্তী পর্যায়ে সংস্কৃতে এবং বাংলায় শব্দের শেষের এই 'ইকা', 'ঈ', 'ই'-তে পরিবর্তিত হয়েছে। আবার বাংলা ভাষায় অপ্রাণীবাচক বা সামান্য বস্তুর ক্ষেত্রে এই 'ঈ' বা 'ই' লিঙ্গ নির্ধারক না হয়ে, শ্রুতিমাধুর্যের কারণেও শব্দের শেষে যুক্ত হতে দেখা যায়। এইভাবেই এসেছে 'পুথী' < (Puthi) > 'পুঁথি' (Puthi) ভারতীয় পাণ্ডুলিপি, বই (Pust-ika), মধ্যযুগীয় বাংলায় পোথা < (Potha) > (Pustaka) ইত্যাদি।[৩]

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা গেল, পুঁথি শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে ভাষাতত্ত্বগত চার প্রকার তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।

১. ইরানি শব্দ 'পুস্ত' (বই) > সংস্কৃত 'পুস্ত' পুস্ত-ক', অপ্রাণীবাচক এবং সামান্য বস্তুর কারণে শব্দের শেষে—'ইকা'-যুক্ত হয়ে 'পুস্তিকা' [Pust, Pust-ka, Pust-ika] শব্দের উৎপত্তি।

২. এই পুস্তক বা পুস্তিকা শব্দের 'স্ত' (St) পরবর্তীকালে 'থ' (th)-এ রূপান্তরিত হয়েছে। পুথি, পুঁথি (পুস্তিকা > পুথিয়া)।

৩. স্বরসঙ্গতির নিয়ম অনুসারে পরবর্তী 'দল'-এর উচ্চ বা নিম্ন স্বর, পূর্ববর্তী 'দল'-এর স্বরকে যথাক্রমে উচ্চ বা নিম্ন করে। 'পোথা' শব্দের নিম্ন স্বর 'আ' বা 'পোথী', শব্দের উচ্চ স্বর 'ঈ', পূর্ববর্তী 'ও' কার (পো)-কে 'উ' কারে (পু) রূপান্তরিত করেছে।

৪. আবার স্বাভাবিক নাসিক্যিভবন-এর নিয়ম মেনে 'পুথি' শব্দ আনুনাসিক ধ্বনি পরিবর্তনে 'পুঁথি' হয়েছে, অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হয়েছে।

বই বোঝাতে আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকেই 'পুস্তক' ও 'পুঁথি' শব্দের সঙ্গে আরও একটি শব্দ পাওয়া যায়। সেটি হল 'গ্রন্থ'। গ্রন্থ শব্দের অর্থ বন্ধন। 'গ্রন্থি', 'গ্রন্থনা' বা 'গ্রন্থিবন্ধ' ইত্যাদি আমাদের অতি পরিচিত শব্দ থেকেই গ্রন্থ শব্দের উৎপত্তি। অন্যদিকে 'পুস্তক' শব্দের অর্থও সেই বন্ধনই। পুস্তক শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত 'পুস্ত' শব্দ থেকে, সংস্কৃত ভায়ায় যার অর্থ 'বন্ধ'।

বই-এর সঙ্গে এই বন্ধন শব্দের এমন একাত্মতার কারণ হল, গ্রন্থ তথা পুঁথি বলতে সেকালে বোঝাত একগুচ্ছ তালপত্র বা ভূর্জপত্র—যার ঠিক মাঝখানে একটি ছিদ্র রাখা হত, সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বন্ধনসূত্র ঢুকিয়ে পুঁথির পত্রগুচ্ছকে বেঁধে রাখা হত। এবং সেই পত্রগুচ্ছকে সুরক্ষিত করবার জন্য তার উপরে ও নীচে দুটি কাঠের ফলক বা পাটা দিয়ে আটকানো থাকত। অনেক সময়ে এই কাজে কাঠের পাটার পরিবর্তে চামড়ার ব্যবহারও লক্ষ করা যায়।

বই-এর সঙ্গে বন্ধন শব্দের যেমন একাত্মতা রয়েছে, তেমনি গাছের ছাল, পাতা ইত্যাদির সম্পর্কও নিবিড়। সংস্কৃত 'পুস্ত' শব্দের অর্থ যেমন বন্ধন, তেমনই ইরানীয় (পল্লভী, Pallavi) পুস্ত (Post) শব্দের অর্থ চামড়া, গাছের ছাল (Skin, Perchment) ইত্যাদি। শুধু এদেশেই নয়, বিদেশেও বই সংক্রান্ত বিভিন্ন শব্দের উৎপত্তি লক্ষ করলে এই একই ইতিহাস পাওয়া যায়।

লাতিন শব্দ 'ফোলিয়েজ'-এর অর্থ গাছের ছাল। এই ফোলিয়েজ শব্দ থেকে এসেছে 'ফোলিও' অর্থাৎ ভাঁজ করা পাতা। 'ফোলিও ভল্যুম' অর্থে বড়ো আকারের বই। অর্থাৎ আমাদের দেশের ভূর্জপত্র তালপাতার পুঁথিরই স্বগোত্র। লাতিন ভাষায় অবশ্য 'বই' বলতে আর একটি শব্দ রয়েছে 'লিবার'। যার থেকে লাইব্রেরি শব্দের উৎপত্তি। বিলেতের 'বিচ' গাছের মসৃণ ত্বক লেখালেখির পক্ষে ছিল খুবই উপযুক্ত। যে-কোনো ধরনের পাণ্ডুলিপি ধরে রাখবার আধার হিসেবে এই বিচ গাছের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় সেখানে। অ্যাংলো স্যাকসন যুগে এই বিচ গাছের স্যাক্সনি নাম ছিল 'বোক'। এই 'বোক' শব্দটি কালক্রমে উচ্চারণের ক্রমবিবর্তনে হয়েছে 'বুক'। গ্রিস দেশে আবার এই একই উপকরণ হিসেবে বিচ গাছের বদলে পাই প্যাপিরাস গাছ। বর্তমান 'পেপার' শব্দের সঙ্গে যার স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। আবার এই প্যাপিরাস গাছের ভিতরের ত্বক বোঝাতে গ্রিক শব্দ 'বিবলোজ' থেকেই এসেছে বাইবেল, বিবলিওগ্রাফি, বিবলিও ফাইল, বিবলিওথেক ইত্যাদি। আমাদের আটপৌরে শব্দ 'বই'-এর উৎস খুঁজতে দ্বারস্থ হতে হয় আরবি ভাষায়। আরবি শব্দ 'বহি' থেকে এসেছে বই। যদিও আরবি 'বহি' বলতে

বোঝায় শুধুই ধর্মপুস্তিকা। সাধারণ যে কোনো বই বোঝাতে আরবিতে আর একটি শব্দ আছে 'কেতাব' বা 'কিতাব'। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সর্বত্রই গ্রন্থের সঙ্গে গাছের ছাল বা পাতার সম্পর্ক নিবিড়।

পাণ্ডুলিপি পুঁথি শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত। পাণ্ডুলিপি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল, [√পাণ্ডু গতি + উ (কু)-ক] শুক্লবর্ণীত বর্ণ বা ধূসর বর্ণ, লিপি (লিপ্ + ই-কর্মবা) লিখিত পত্রাদি] ধূসর বর্ণের লিখিত পত্রাদি। প্রাচীন যুগে পশুচর্ম, ভূর্জপত্র, তালপত্র ইত্যাদি লেখার উপকরণগুলি লেখার উপযোগী হিসেবে তৈরি করতে শুকিয়ে নিতে গিয়ে এগুলি পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করত। প্রাচীন গ্রন্থগুলি এই সব পাণ্ডুবর্ণের উপাদানে লেখা হত বলে এদের বলা হত পাণ্ডুলিপি। পুঁথি বলতে এই পাণ্ডুলিপি শব্দের ব্যবহার অনেক পরবর্তী কালের, সম্ভবত এদেশে ইংরেজদের আগমনের পরে।

বাইরে থেকে দেখতে গেলে, সেকালের পুঁথি ও বর্তমান কালের পুস্তকের, তথা বই-এর মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে। যে কোনো বই-এর পাতাগুলি যেমন একসঙ্গে সেলাই করে বাঁধা থাকে, যাতে করে একটি থেকে অপরটি আলাদা বা বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে, পুঁথির পাতার বেলায় কিন্তু ঠিক তার বিপরীত কথাটিই সত্য। তালপাতার পুঁথিই হোক আর হাতে তৈরি তুলট কাগজের পুঁথিই হোক, তাদের প্রত্যেকটি পাতাই খোলা বা পরস্পর পৃথক অবস্থায় থাকে। অনেক সময়ে সেই পাতাগুলির ঠিক মাঝখানটিতে রাখা নির্দিষ্ট একটি ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে বন্ধন সূত্রটি ঢুকিয়ে দিয়ে এলোমেলো পাতাগুলিকে একত্রিত করে বেধে রাখা হত।

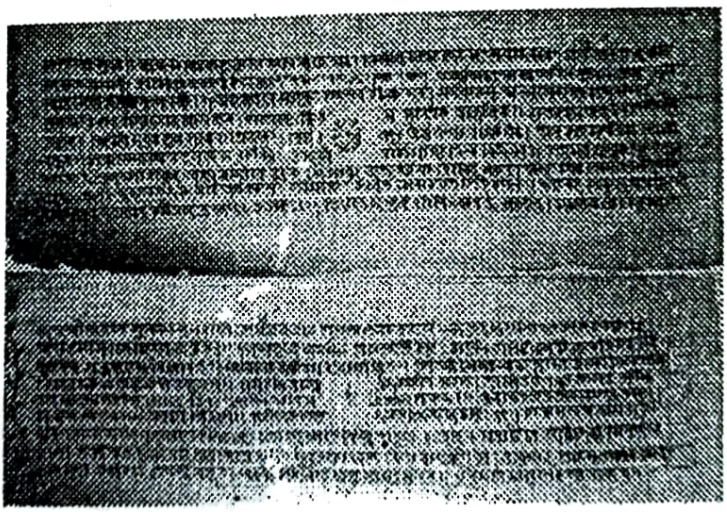

তুলট কাগজের পুঁথির পাতার মাঝখানে বন্ধনসূত্রের জন্য রাখা শূন্যস্থান

তথ্য-নির্দেশ :

১। Origin and Development of Bengali Language—by Suniti Kumar Chatterjee, Vol. 1. P.194

২। Ibid, P. 503-504.

৩। Ibid, Vol.2, P. 672-673.